দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 NOV 1993

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মুহাম্মদ ইলিয়াস মজুমদার

যখন বলা হয় 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড', তখন যথেষ্ট বলা হয় না। 'শিক্ষাই জাতির প্রাণ', একথা বলাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ শিক্ষা ছাড়া জাতির অস্তিত্বই অর্থহীন। বৃষ্টি যেমন মৃত মাটিকে প্রাণের সঞ্চার করে শিক্ষাও তদ্রূপ নিষ্প্রাণ জাতিকে সঞ্জীবিত করে। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই মর্যদা সহকারে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষার যা অবস্থা, তাতে জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস যে জাতিকে ক্রমশ রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, নিঃশব্দে ও নিশ্চিতভাবে, এতে কোন সন্দেহ মাত্র নেই।

এমনিতেই দেশের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম। তদুপরি যারা 'শিক্ষিত' হওয়ার সার্টিফিকেট লাভ করেছে তারাও যদি 'অকেজো' ও 'দুর্নীতিবাজ' প্রমাণিত হয়, তবে বলতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রতিবছর যে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে 'শিক্ষিতের সার্টিফিকেট' নিয়ে বেরিয়ে আসছে, তারা দেশের সমস্যা সমাধানে কোন যোগ্যতাই রাখে না। বরং তারা নিজেরাই জাতির জন্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষার মানের ও সেই সঙ্গে নব্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নৈতিক মানের যে অবনতি ঘটছে, তা যদি অচিরেই রোধ করা না যায়, তবে সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন দেশ পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে 'বিশেষজ্ঞ' আমদানী করতে হবে। এ অবস্থার অচিরেই অবসান হওয়া উচিত। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী কারণগুলোকে চিহ্নিত করা এবং পর্যায়ক্রমে একের পর এক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে কারণগুলোকে দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। এখন দেখা যাক—কারণগুলো কি এবং এর সমাধানই বা কি?

এক. ছাত্র সংখ্যানুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই কম। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামেরও যথেষ্ট অভাব। কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে স্কুল-কলেজগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও বেশী ভাল নয়। অতএব, এদেশে শিক্ষা লাভ করাটাও এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু শিক্ষা সহজলভ্য না হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষাকে সহজলভ্য করা। এজন্য আরও অধিকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা আবশ্যক।

দুই. যোগ্য শিক্ষকের অভাব। বর্তমান পেশা হিসাবে শিক্ষকতা আকর্ষণীয় নয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি যে একটা বিজ্ঞান এবং শিক্ষক ছাড়া জাতি অচল—এ বোধটুকু সবার থাকা দরকার। বিশেষ করে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' 'শিক্ষকরা সবচেয়ে সম্মানের পাত্র' ইত্যাদি কথা দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। ভাঙ্গা স্কুল ঘর আর অভুক্ত শিক্ষক শিক্ষার প্রতি দরদ এবং শিক্ষকের প্রতি সম্মানের প্রমাণ নয়। এর দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, ঔপনিবেশিক প্রভুরা এ দেশবাসীকে যে দৃষ্টিতে দেখত; আমাদের দেশীয় প্রভুরাও একই দৃষ্টিতে দেখে। অতএব, এ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।

তিন. পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা। পাঠ্য-পুস্তক যা আছে—তার কাগজ ও মুদ্রণ অত্যন্ত নিম্নমানের। এগুলোতে রয়েছে অসংখ্য বানান ও তথ্যগত-তত্ত্বগত ভুল এবং এসবের ভাষাও ত্রুটিপূর্ণ। মৌলিক ও সৃজনশীল লেখা নেই বললেই চলে। ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ ও চরিত্র গঠনের সহায়ক বইয়ের অভাব প্রকট। তাছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। তারা এসব বোঝা বহন করতে অক্ষম—শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই। ফলে তারা নকলবাজির দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতএব, সুপাঠ্য, সুলিখিত, নির্ভুল, চরিত্র গঠনোপযোগী এবং ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক পুস্তক পাঠ্য করা উচিত। পাঠ্যপুস্তকে যাতে জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটে, সেদিকেও খেয়াল রাখা আবশ্যক।

চার. ১ম শ্রেণীতে শুধু বাংলা ও গণিত, ২য় শ্রেণীতে বাংলা, আরবী ও গণিত, ৪র্থ শ্রেণীতে বাংলা, আরবী ও গণিতের পাশাপাশি ইংরেজী চালু করা যেতে পারে। ৩য় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য বইয়ের মধ্যেই ব্যাকরণ, ইসলামিয়াত ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠার পর একটি বৃত্তিমূলক (বা কর্মমুখী) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেয়া দরকার। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাসের জন্য বাংলা ও গণিতকেই যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়গুলোকে উচ্চতর ডিভিশনের জন্য রাখা যেতে পারে। নবম ও দশম শ্রেণীতে প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা বই থাকা দরকার। বাংলা ও অংকের পাসের জন্য শতকরা ৫০ নম্বর, ইংরেজী ও ইসলামিয়াতের জন্য শতকরা ৪০ নম্বর এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য শতকরা ৩০ নম্বর পাওয়া আবশ্যক মনে করা যেতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, অল্প শিখ কিন্তু ভাল করে শিখ। কারণ, ব্যাপক, বিশাল অথচ ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, কিংবা খাপছাড়া শিক্ষা-শিক্ষার্থী এবং সেই সঙ্গে দেশের কোন কাজে আসে না।

পাঁচ. ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি। বর্তমান পদ্ধতিতে ছাত্রদের মেধা যাচাই হয় না। বরং মেধার বিনাশ হয়। কে কতটুকু মুখস্থ করতে পারল বর্তমান পদ্ধতিতে তারই পরীক্ষা হয়। স্কুলগুলোতে এমনকি কলেজগুলোতেও কোন কিছু শেখান হয় না। শুধু মুখস্থ করতে শেখান হয় এবং পরীক্ষাতে মুখস্থ বিদ্যারই যাচাই হয়। তাছাড়া পরীক্ষার খাতা দেখার নিয়মও অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রশ্নের ধরন এমন যে, একই খাতা বিভিন্নজনকে দিয়ে পরীক্ষা করালে নম্বরও বিভিন্ন হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। পরীক্ষকের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মেজাজ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রভৃতি খাতা দেখার সময় তাকে প্রভাবিত করে। ফলে, অনেক সময় ভাল লিখেও অনেক পরীক্ষার্থী কম নম্বর পায়; আবার খারাপ লিখেও অনেকে বেশী নম্বর পায়। এভাবে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। ছাত্ররাও শিক্ষার চেয়ে সার্টিফিকেট পাওয়াটাই বড় মনে করে। নকলবাজির এটা একটা বড় কারণ। বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল। সারাদেশের পরীক্ষা একই সময় কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সময় গোটা দেশে একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এ সময় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো রীতিমত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাটা রীতিমত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যে পুলিশ, বিডিআর বাহিনীকে মোতায়েন করতে হয়। এ অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। পরীক্ষার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজগুলোকে বহন করতে দেয়া উচিত। তারাই প্রশ্ন করবে, পরীক্ষা নেবে, খাতা দেখবে এবং সার্টিফিকেট প্রদান করবে। তবে পরীক্ষা তদারকির জন্য বোর্ডের মনোনীত কোন অফিসার থাকতে পারেন এবং খাতা দেখার পর ঐ সকল খাতা বোর্ড থেকে Authenticated করিয়ে আনা যেতে পারে। এর ফলে দুর্নীতি ও নকলবাজি একেবারে বন্ধ না হলেও অন্ততঃ কমে যাবে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো নিজেদের সুনাম রক্ষার্থেই আরো বেশী সতর্ক এবং আরও বেশী দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠবে। স্কুলের কৃতিত্ব সাফল্য নির্ভর করবে তাদের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় ও কর্মজীবনের সাফল্যের উপর। এর ফলে স্কুলগুলোর মধ্যে একটা পারস্পরিক সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কার্যত মূল্যহীন প্রমাণিত হবে। সার্টিফিকেটকে যারা শিক্ষার মানদণ্ড মনে করে তাদেরও ভুল ভাঙবে। অযোগ্য ও অমনোযোগী শিক্ষকরাও এ অবস্থায় বেশী দিন টিকতে পারবে না। হয় তারা নিজেদেরকে সংশোধন করবে; নয় তারা শিক্ষকতা থেকে সরে দাঁড়াবে। এভাবে শিক্ষকতায় যোগ্য লোকের আগমন ঘটবে এবং নকলবাজিও বন্ধ হবে। পরীক্ষা যাতে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হয়, সেজন্য সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে একজন শিক্ষকের জন্য প্রতিনিধিও থাকতে পারেন। এ অবস্থার ফলে শিক্ষকদের প্রতি সরকারের তথা দেশবাসীর আস্থার মনোভাব প্রকাশ পাবে। আশা করা যায়, এর দ্বারা তাদের আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হবে এবং তারাও আরও বেশী দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠবেন। এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রধান শিক্ষকের উপর সর্বাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হবে, তিনি হবেন স্কুলে সর্বেসর্বা। তাই তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে সর্বাধিক ক্ষমতাও দিতে হবে। স্কুলের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি সব কিছুর জন্য তিনি হবেন জনগণের কাছে এবং সরকারের কাছে জিজ্ঞাসিত। তাঁর পদ ও পদবীর উন্নতি-অবনতি স্কুলের উন্নতি-অবনতির সাথে বাঁধা থাকবে। ফলে স্কুলগুলোতে প্রাণের সঞ্চার হবে।

(চলবে)